গায়ত্রী সন্ধ্যা : দেশভাগের মহাকাব্যিক সময়সারণি

মিল্টন বিশ্বাস

২০২০ সালের ১৪ জুন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ৭৪তম জন্মদিন ছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জলোচ্ছ্বাস'(১৯৭২), প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর'(১৯৬৯)। ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'বিষণ্ন শহরের দহন' এবং 'সময়ের ফুলে বিষপিঁপড়া' তাঁর ৪৫ ও ৪৬তম উপন্যাস। আর ২০১৮ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ হলো 'রক্তফুলের বরণডালা'। তাঁর 'আগস্টের এক রাত' (২০১৩) ও 'সাতই মার্চের বিকেল' (২০১৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত আবেগী কথামালার বিন্যাস। 'হাঙর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬), 'যুদ্ধ'(১৯৯৮), 'গেরিলা ও বীরাঙ্গনা'(২০১৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অন্যতম উপন্যাস। তিন খণ্ডে রচিত 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'তেও বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসগুলোর অধিকাংশ পাঠ করলে এই কথাসাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রত্যয় লক্ষ করা যায়; উজ্জীবিত হওয়া যায় তাঁর বাঙালির প্রতি মমত্ববোধ দেখে। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল শুভ প্রয়াসের পূজারি। বিষয় ও চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের জগৎ ছুঁয়ে তিনি আমাদের আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গহীনে প্রবেশ করেছেন অবলীলায়। ব্রিটিশ ভারতের সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগ, পূর্ব পাকিস্তানের তেভাগা এবং ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ কালপর্বে তিনি ব্যক্তিক ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন। এজন্য কাহ্নু পা, চাঁদ সওদাগর, কালকেতু-ফুল্লরা যেমন তাঁর উপন্যাসের চরিত্র তেমনি ইলা মিত্র, প্রীতিলতা, মুনীর চৌধুরী, সোমেন চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত পাত্রপাত্রী। মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাইরে তিনি গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সাধারণ মানুষের কথাও লিখেছেন। আবার নাগরিক জীবনের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন কাহিনির বিচিত্র গতিসূত্রে। উপরন্তু ব্যবচ্ছেদ হওয়া বেদনার কথাও তাঁর শৈল্পিক নির্মিতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত শোকের স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করেছেন আবার বিএনপি-জামায়াত জোটের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে অপদস্থ মানুষ ও নারী নির্যাতনের কাহিনি কুশলি বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর কথাসাহিত্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্ত। আর কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা কেন্দ্রীয় ঘটনার বক্তব্যে তিনি সদর্থক জীবনের জয় ঘোষণায় অকুণ্ঠ। কথাসাহিত্যে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের মর্মান্তিক ক্ষরণ ও যন্ত্রণা; অপমৃত্যু ও অসীম বেদনা; সকল শুভ প্রয়াসের অন্তর্ধান তবে এসবই তাঁর উপন্যাস কিংবা গল্পের শেষ পরিণতি নয় বরং তা থেকে উত্তরণের পথ উজ্জ্বল শিখায় বর্ণময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি শেষ পর্যন্ত জীবনের কথাই বলেন; জীবন থেকে পলায়নের নয়। বর্তমানে স্বপ্ন দেখানোর মানুষ কমে গেছে; হতাশার জয় ঘোষিত

হচ্ছে চারিদিকে। এ পরিস্থিতিতে সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য মানব জীবনের ইতি-নেতির গল্পের ধারায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিজয় হিসেবে বিশিষ্ট। উল্লেখ্য, দুই বাংলায় তিনিই প্রথম মির্জা গালিবকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন; বঙ্গবন্ধুকে উপন্যাসের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। উভয় বাংলায় ছিটমহল নিয়ে প্রথম উপন্যাস রচনার কৃতিত্বও তাঁর। পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে আখ্যানে উপস্থাপনও তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। 'পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু' একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭; রাজশাহী শহরে। সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (তিন খণ্ড), 'সোনালি ডুমুর', 'যাপিত জীবন' এবং 'ভূমি ও কুসুম' উপন্যাসে দেশভাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

২.

১৯৪৭ সালের মধ্যরাত্রির স্বাধীনতার নেতিবাচক ফল, উন্মূলিত অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী আর্তনাদ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা দুই প্রধান পরিবারের পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনা তরঙ্গিত আবর্তের যোগফলে দ্বান্দ্বিক-অন্তর্ময় সম্পর্কসূত্র নিরূপিত ও চিত্রায়িত হয়েছে সেলিনা হোসেনের ট্রিলজি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে। ১৯৪৭ এর ভারত-বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সময়পরিসরকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক। জাতির সমাজ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণিত ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের অন্তরঙ্গ বিন্যাসে এ উপন্যাস বিশিষ্ট।

গায়ত্রী সন্ধ্যা-র প্রথম পর্বের (১৯৯৪) ঘটনাকাল ১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের কালানুক্রমিক ইতিহাস বাঙালির জীবনাভিজ্ঞতার রক্তাক্ত অধ্যায়। একদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ ভারতবিভাগ, অন্যদিকে দেশবিভাগের ফলস্বরূপ বাংলাভাষী অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি- এই রাজনৈতিক মীমাংসা অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণির জন্য ছিল অসঙ্গত, ঐতিহাসিক ধারার পরিপন্থী একটি সিদ্ধান্ত। কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক-সামাজিক কোন দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের সমকক্ষ ছিলো না। এজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ধূর্ত শাসকগোষ্ঠী এবং আধুনিক শিক্ষাবিবর্জিত সামন্ত-মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের সুযোগপ্রাপ্ত ঢাকার নবাব পরিবার ও তাদের কতিপয় অনুসারী পূর্ববাংলাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজ রূপে। কিন্তু 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচি ছিলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। এদেশের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবন, সমাজবিন্যাস এবং আর্থ-উৎপাদন কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ-ধর্মকে স্থাপন করলো সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে।[১] ফলে পূর্ব বাংলার ভূ-খণ্ডে দু'শ্রেণির মধ্যবিত্ত চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে, একশ্রেণি সামন্তমূল্যবোধ আশ্রয়ী ধর্মীয় ঐক্যের মানদণ্ডে স্বাগত জানায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানকে; অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রত্যাখ্যান করে ধর্মকেন্দ্রিক, পাকিস্তানি শাসকবর্গের জাতিশোষণ, শ্রেণিশোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসী মনোভাবকে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই মোহভঙ্গের ফলে ঢাকা নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রথম প্রতিবাদ করছিল ১৯৪৮-এ। অন্যদিকে ১৯৪৭-১৯৫১ সময় প্রবাহে পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘটে একাধিক ঘটনা। বিভাগোত্তরকালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ভিত্তিতে বহুসংখ্যক মুসলিম বাস্তুচ্যুত পরিবারের পূর্বাঞ্চলের আগমন এবং পরবর্তী সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনজীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ।

'পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির ফলে কর্ডন ও লেভির অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমাগত।'[২] ফলে জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনগণের খাদ্যসঙ্কট ও পাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র কৃষক জনতার ভেতর আন্দোলনের সম্ভাবনা অনিবার্য করে তোলে। সিলেটে জমিদারি নানকার প্রথাবিরোধী আন্দোলন (১৯৪৮-৫০), ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারি ও টঙ্ক প্রথাবিরোধী আন্দোলন (১৯৪৯-৫০), নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৫০) আন্দোলন ও তার পরিণাম এবং তৎকালীন সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দমননীতির বর্বরতা নৃশংসতা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামশীল' করে তোলে। '১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের সাময়িক সাফল্যের পর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিচিত্র প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে থাকে।'[৩] এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বার্থ-রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান 'আওয়ামী মুসলিম লিগে'র জন্ম হয়। 'প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লিগ গঠিত হলেও এই সংগঠনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে ওঠে।'[৪] এ সময় বিভাগোত্তর কালের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' ক্রমশই কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বিধাবিভক্ত ও তাত্ত্বিক বিতর্কের ফলে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা জেলায় এর অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। 'রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে বিতর্ক, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তাত্ত্বিক বিরোধ, মুসলিম লিগ সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি-- প্রধানত এইসব কারণে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়।'[৫]

কেন্দ্রীয় সরকারের অবদমন নীতি ও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের নব্য-কালোনিতে পরিণত করার চক্রান্তে এবং রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যে গভীর ষড়যন্ত্র ও বিতর্ক উত্থাপিত হয়, এরই ফলে সংগঠিত হয় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮-১৯৫২ এই কালক্রমিক ঘটনাপ্রবাহে 'রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচণ্ড দমন, নির্যাতন ও গ্রেফতার সত্ত্বেও ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তদানের প্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র রূপ ধারণ করে।'[৬] কারণ এই 'ভাষা আন্দোলনের সাথে কেবল ভাষা আর সংস্কৃতির প্রশ্নই জড়িত ছিলো না: এর মূল নিহিত ছিলো বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের গভীরে।'[৭]

দেশ-বিভাগোত্তর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক কূটজাল, অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্মীয় কলহ ও দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তারের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্য ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভ অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু 'যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চক্রান্তে বাংলাদেশের খাদ্যপরিস্থিতির অবনতি ও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গার সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পটভূমি তৈরি করা হয়। ১৯৫৪ সালে মে মাসে বাতিল করা হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। এটা ছিলো বাংলাদেশের সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদের প্রথম আঘাত, কিন্তু মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯-এর পূর্বে পুঁজিবাদ এখানে জয়যুক্ত হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান হল সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর শেষ ও চরম আঘাত। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক

ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বারবার মন্ত্রিসভার পতন সুগম করে দেয় পাকিস্তান সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পথ।'[৮]

বস্তুত দেশ-বিভাগ থেকে ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পাঁচ বছর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বন্দ্ব-জটিল হলেও এর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি ছিল সকল বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিমামণ্ডিত করার কাল। এদিক থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লিগের কাউন্সিল অধিবেশনের আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কথা উল্লেখযোগ্য। 'রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এই যোগসূত্র নির্মাণ ছিলো খুবই তাৎপর্যবহ।'[৯]

উপরে বর্ণিত এই সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব-সঙ্কট ও সংঘর্ষের অন্তর্ময় রূপায়ণ 'গায়ত্রীসন্ধ্যা'-র প্রথম পর্ব। মধ্যবিত্ত মানসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জীবনে রাজনৈতিক প্রতিঘাত ও পাকিস্তানি প্রশাসনের প্রতি সর্বস্তরে মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণা এ- পর্বের প্রতিপাদ্য। তবে একইসঙ্গে পাকিস্তানি প্রশাসনের সহযোগীদের চারিত্র্য উন্মোচনে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় বিষয়-ভাবনা লক্ষণীয়।

উপন্যাসের শুরুতে দেশ-বিভাগের ফলে উদ্ভুত সংকটের আবর্তে পতিত কয়েকটি পরিবারের 'মুসলমান' হওয়ার অপরাধে নিজেদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এদের মধ্যে ত্রয়ীর (১ম পর্বে) দীর্ঘ সময়-প্রবাহের সাক্ষী আলী আহমদ এবং হেড মাস্টার নসরুল্লাহর পরিবারকে কেন্দ্র করে ঘটনাধারা বিস্তার লাভ করে। ভারতের সীমানা অতিক্রম করার পর আলী আহমদের উন্মূলিত হবার যন্ত্রণা মধ্যবিত্তের স্বভাবধর্মকেই প্রকাশ করে : 'ও বিতাড়িত হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। এই অন্ধকারের দিক তাকিয়ে আলী আহমদ মনে মনে বলে, ধর্ম একটি পবিত্র অনুভূতি, গভীর বিশ্বাস। অথচ ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে কুকুর বানাচ্ছে। কিভাবে জীবনের সবটুকু ওলোটপালট হয়ে গেলো, ভাবতেই শরীর দুলে ওঠে, বমি পায়, মুখভর্তি থুতু। এখন যদি পুষ্পিতাও মরে যায়?'[১০]

গর্ভবতী স্ত্রী পুষ্পিতা ও জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রদীপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রোহনপুর স্টেশন থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা যেন বাঙালি মধ্যবিত্তের দীর্ঘ যাত্রার ইঙ্গিতময় রূপায়ণ। এ সময়ই রেলে জন্ম হয় প্রতীকের। রেলযাত্রা ও প্রতীকের জন্ম আলী আহমদের নতুন দেশে নতুন জীবনের শুরুতে 'ও আমার হৃদয়ের প্রতীক' মনে হলেও মোহভঙ্গের সূচনা হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই।

উপন্যাস বিধৃত একগুচ্ছ চরিত্রের ভেতর নাচোলে আশ্রয়ী হেডমাস্টার নসরুল্লাহ ও তার বড় ছেলে মফিজুলের পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা উপন্যাসে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে। রাজশাহীর গোরহাঙ্গার নিবাসী ও রাজশাহী কলেজের বাংলার অধ্যাপক আলী আহমদ এবং রাজশাহী কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্যে আগত মজিফুল নতুন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে তাদের জীবনে সংকটের ছায়ামূর্তি লক্ষ করে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নতুন রাষ্ট্রে তাদের প্রত্যাশার মোহভঙ্গের সূচনায় 'মহাত্মা গান্ধী'র নিহত হবার সংবাদ তাদের স্মৃতিভারাতুর মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ের পর রাজশাহীতে বামপন্থীদের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনাসূত্র অঙ্কিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কিন্তু গ্রামীণ জীবনের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে তেভাগা আন্দোলন রাষ্ট্রের মানুষের স্বস্তির সপক্ষে সংগঠিত হবার প্রয়াস পেলেও সুসংগঠিত জাতীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতির জন্য শেষাবধি এই সব 'অসংবদ্ধ ও অঞ্চলভিত্তিক' আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

মফিজুলের পিতা নসরুল্লাহর তেভাগা আন্দোলনে সংযুক্ত হবার পিছনে ছিল অসহায় বৃদ্ধ হানিফের অমানবিক মৃত্যু। 'মানুষের এমন মৃত্যু হবে কেন? পথের ধারে উল্টে পড়ে আকাশের দিকে পাছা উঁচু রেখে?'-বুড়ো হানিফের মৃত্যু নসরুল্লাহর দৃষ্টিতে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে সমাজ একজন বৃদ্ধের একবেলা একমুঠো অন্নের যোগান দিতে ব্যর্থ, যে সমাজে নিজ সন্তানদের কাছে বৃদ্ধ হানিফ হয় অপমানিত। একই কারণে তাই ফকির আলীর ন্যাংটো হয়ে তেঁতুল গাছে ফাঁস দিয়ে মৃত্যুও নসরুল্লাহর কাছে সমাজের প্রতি ভেংচি কাটা মনে হয়েছে।

নসরুল্লাহ 'আমার বিশ্বাস আমার ধর্ম আমি যেভাবে খুশি সেভাবে পালন করবো'-বললে, সমাজের নেতৃত্বকারী ওসমান গণির মতো লোকের বিরাগভাজন হতে হয়। এজন্য ফকির আলীর কুলখানি শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় নসরুল্লাহ আক্রান্ত হয় সমাজ নেতৃত্বকারীদের পোষা গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা। এ সময়ই আলী আহমদের নাচোলে আগমনের ঘটনায় ঔপন্যাসিকের গ্রাম ও শহরের ঘটনাস্রোতকে একীভূত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ভাষা' প্রশ্নে ঢাকায় ছাত্র প্রতিবাদের ঘটনা যেমন রাজশাহীতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তেমনি গ্রামগুলোতে তার তরঙ্গ এসে পৌঁছায়। গ্রামবাসীরাও নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে সচেতন হয়ে উঠেছে দেখা যায়। গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস ঔপন্যাসিক মফিজুলের রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে বন্দি হবার ঘটনার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে রাজশাহীতে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না দেওয়ায় ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'কিছু ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে মফিজুল একজন।'[১১]

মফিজুলের জেলে যাবার ঘটনার সূত্রে স্বাধিকার আন্দোলনের বাস্তবতা অন্বেষণটি তার জীবনসত্যের সঙ্গে একীভূত। রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে মফিজুলের সাক্ষাৎ হয় তেভাগা আন্দোলনের নেতা কুষ্টিয়ার হানিফ শেখ আর দিনাজপুরের কম্পরাম সিং-এর সঙ্গে। অন্যদিকে বিপ্লবী হিসেবে খ্যাত হাজী দানেশ, জান খাঁ, সীতাংশু, অমূল্য প্রমুখ রাজবন্দীর সংস্পর্শে সে অতীত ইতিহাসের কাছ থেকে আন্দোলনের প্রেরণা সঞ্চয় করে। আর জেলের বাইরে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজিত জনজীবন; তেভাগার প্রাণকেন্দ্র ইলা মিত্রের নাচোলের গ্রামগুলির উত্তপ্ত সঙ্কটকাল। এসব ঘটনা আলী আহমদের জীবনাভিজ্ঞতায় জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটায়। এজন্য মদনদের স্বতন্ত্র ধর্মের কারণে দেশত্যাগ যেমন তাকে মর্মাহত করে তেমনি ইলা মিত্রকে গ্রেফতার করে, তাঁর সনাক্ত করার দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী নসরুল্লাহর গৃহ প্রজ্বলন একইসঙ্গে পুনরায় তাঁকে মূলোচ্ছেদিত হবার যন্ত্রণায় দগ্ধ করে।

আলী আহমদের মনে হয়, 'এদের কারো দলেই পড়ে না, ওর ভেতর বেদনা আছে, হয় তো বা দুঃখবোধও, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ওর ভেতরে কেবলই প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে, অনেক ধরনের প্রশ্ন। একধরনের দার্শনিক বোধ ওকে আক্রান্ত করে রেখেছে, জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলো ওকে তাড়িত করছে। ও ভাবছে এই চলাটা চলা নয়, জীবনের এই

পরিণতি নয়, এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। তবে কি আমরা ভুল পৃথিবীর মানুষ? জীবনের উল্টোরথে চেপে বসেছি?'[১২] আলী আহমদের জিজ্ঞাসাজর্জরিত মানবচেতনা চরমভাবে বিপর্যস্ত, নিঃসঙ্গ হতচকিত হয় খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের উপর পাকিস্তানী প্রশাসনের নির্মম গুলি চালানোর ঘটনায়। 'খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি চালানোর খবর শোনার পর থেকে একটা লাল রঙের মহানন্দা নদী আলী আহমদের চোখের সামনে দিয়ে বইতে থাকে। স্বপ্নে বাস্তবে নদীটা ওকে ভূতের মতো তাড়া করে। জেলখানার লোকজনকে ধরে মফিজুল বেঁচে আছে এই খবরটা পেয়েছে, দেখা করার সুযোগ নেই।'[১৩]

ইলা মিত্রের কোর্টে প্রদত্ত লোমহর্ষক জবানবন্দি পাঠ ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাধারণ জনতা ও ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতির প্রতিবাদে নিজেদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সালে পুনরায় তীব্র খাদ্যসঙ্কট দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতন জনজীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। ফলে আলী আহমদের মনে হয় এই সব লেখালেখি, কি হচ্ছে, কতোদূর এগুনো যাবে, অনবরত যে শুনতে হয়, এক মুঠ ভাত দেন আম্মা? অথচ আলী আহমদ এই অচেনা দেশকেই আপন করেছে, বাঁচতে চেয়েছে ন্যায্য অধিকার নিয়ে।

আলী আহমদের রাজশাহী কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে বদলির সূত্রে আমরা ঢাকার নাগরিক জীবনে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের সংবাদ ও ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীর লিপিবদ্ধ নিদর্শন উপন্যাসে বিধৃত হতে দেখতে পাই। ভাষা আন্দোলনে যে কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সন্তান মফিজুলরাই শহীদ হয়েছিল এমন নয়, অহির মতো নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তানরাও এই আন্দোলনে সংযুক্ত হয়ে শহীদ হয়। অহিকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিধবা মা ও ছোটবোন রিনিকে নিয়ে সীমাবদ্ধ আয়ের সংসারে প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহ করতে হতো, সেই অহিও একদিন ঘটনাপরম্পরায় ডোম পাড়ার বুলু দাসের সাহচর্যে ক্রমশই জীবনকে চিনতে শেখে নির্মম বাস্তবতার স্পর্শে। এজন্য অসুস্থ ছোটবোন রিনির মৃত্যু এবং মা'র পুনর্বিবাহ-বন্ধন তাকে উন্মূলিত, একাকী ও নিসঙ্গ করে তোলে। অহি, বুলু দাস ও মা'র কাছে তার পিতার হত্যার রহস্য সম্পর্কে গল্প শুনেছিল। তার পিতা মহল্লার গুণ্ডাদের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে শহরে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত নিজে খুন হয়েছিল সেই কাহিনি অহিকে নতুন বোধে পৌঁছাতে সাহায্য করে। তার মা'র কণ্ঠে শুনতে পায় সে :

'যারা বাধাবার তারা স্বার্থের জন্য ঠিকই বাধাবে, যারা কাজটা করবে তারাও টাকার লোভ ছাড়তে পারবে না। এগুলো হতেই থাকবে রে অহি, হতেই থাকবে।'[১৪]

একজন নিম্নবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা উপন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। এজন্য অহি'র প্রদীপ্তর সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন শ্রেণির ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার স্পর্শলাভের ইতিবৃত্ত হয়ে ওঠে। আলী আহমদ অহিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু অহির চেতনায় 'আচ্ছা বুলুদা তুমি যদি কোনোদিন আমাকে লাশকাটা ঘরে পাও তো কি করবে?'- এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে বুলুদাস মিছিলে গুণ্ডাবাহিনীর হামলায় সোমেন চন্দের মৃত্যুর গল্প বলে এবং নিষেধ করে অহিকে 'তুই কোনোদিন মিছিলে যাবি না।'

কিন্তু দেশে ইতোমধ্যে 'রাষ্ট্রভাষা' প্রশ্নে পুনরায় বিতর্কের সূচনা হয়। ১৯৪৮ সালে প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী নাজিমুদ্দীন ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে পল্টন ময়দানে ২৬শে জানুয়ারির ভাষণে অগ্রাহ্য করে উর্দুকে

রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ করলে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 'নাজিমুদ্দীনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ গ্রহণ করলো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প। গঠিত হলো 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' (৩০ শে জানুয়ারি ১৯৫২), ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা-প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়। গণশক্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা ঘোষণা করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বিধান্বিত মনোভাব এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত ছাত্রসমাজ সুদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত প্রকাশ করে। গ্রেফতার এবং নির্যাতন সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের শ্লোগানমুখর বিক্ষুব্ধ মিছিল অগ্রসর হতে থাকলে দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য পুলিশ ছাত্রমিছিলে গুলি চালায়।'[১৫]

ঘটনাস্থলে শহীদ হয় অহি। মর্গে তার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বুলু দাস স্তম্ভিত হয়ে যায়। মফিজুল গুম হয় সরকারের পোষা বাহিনীর নৃশংসতায়।

> 'আমার মফিজুল মিশে গেছে সারা পূর্ববাংলায়। কোনো এক জায়গায় ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মৃত অথবা জীবিত।'[১৬] মফিজুলের নিখোঁজ হওয়া তাই আবার আলী আহমদকে স্মরণ করিয়ে দেয় মধ্যবিত্তের সঙ্কট এমনই। 'প্রতিদিনের নুনভাতের জন্য লড়াই নয়। লড়াই করতে হয় স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য, যা কুরে কুরে খায় শক্তি।'[১৭]

এই মধ্যবিত্তের স্বকীয়তার লড়াইয়ের ইতিহাস সৃজিত হয় প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠান প্রচলনের মধ্য দিয়ে। একইসঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও সাধারণ নির্বাচনে তাদের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা।

> 'বাংলাদেশের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির বিজয়ে অবাঙালি আমলা ও শিল্পপতিরা হয়ে ওঠে উদ্বিগ্ন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ থাকায় পাকিস্তানী পুঁজির একচেটিয়া স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলো।'[১৮]

ফলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চক্রান্তে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, খাদ্যসঙ্কট এবং দাঙ্গার প্ররোচনা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পটভূমি তৈরি করে। এজন্য পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনায় দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও সামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা দখলের ক্রমিক ধারা। এই ষড়যন্ত্র, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ তাই একজন শহিদ সাহেবের মতো বিবেকবান কবিকেও নিস্তব্ধ করে দেয়। তার বিষকন্যা গল্পের জনৈকা পাঠিকার টেলিফোন থেকে তাকে ভালোলাগার প্রত্যাশা জেগে উঠলেও শেষাবধি

> 'ও ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না। কতোকিছু বলতে চায়, বলা হয় না। মাথা কাজ করে না। শুধু একটার পর একটা সিগারেট টানে। ইদানিং খিদেও পায় না। জোর করে খেলে বমি আসে। চারদিকের সবকিছু নরক হয়ে যাচ্ছে। কখনো গভীর রাতে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বুক শূন্য হয়ে গেলে ঘুম আসে।'[১৯]

আলী আহমদ শহিদ সাবেরকে দেখে আর আশ্চর্য হয়। সংবাদ অফিসে তারা

সম্মিলিত হবার পর দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। জনগণ বিচ্ছিন্ন এই মধ্যবিত্তমানস সরকারের দমন, শোষণ সম্পর্কে সচেতন হলেও তারা ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না। এজন্য ঔপন্যাসিক ফ্যান্টাসির জগতে অহির রাজপথে পদচারণার মধ্য দিয়ে সমাজসত্তার অনিবার্য প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেন। বুলু দাসের অন্তর্ময় উপলব্ধি : 'রাপজথে মিলিয়ে যায় অহি। গাড়ি ঘোড়া, দোকানপাট কোনোকিছুতে ওর পথ আটকায় না। ও চলে যাচ্ছে অবলীলায় বুলু দাস পিছন ফিরে হাঁটে। ও হিসাব করে দেখলো মাত্র তিন বছরে ও নিজেকে অনেক বদলেছে। যে সরকার বায়ান্নোর একুশে গুলি ছুঁড়েছিলো তারা নির্বাচনে হেরেছে। এখন নতুন সরকার দেশে। বুলু দাস ছেলের জন্য ওষুধ কেনে। ওর এখন সংসার হয়েছে। ঘরে বৌ আছে। হাতের কাছে তাড়ি আছে। নেশায় চুর হওয়া যায়। এতো কিছুর মধ্যেও অহি ওকে হিম করে রাখে। কিছুতেই ভোলা যায় না। কেমন করে অহি ওকে এমন মায়ার বাঁধনে বাঁধল। বুলু দাসের অবচেতনেও শুয়োরের রগরগে লাল মাংস, রক্তের মতো টকটকে এবং উষ্ণ।'[২০]

১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারিতে অহির এই রাজপথ ভ্রমণ বাঙালির উদ্দীপনার প্রতীক। এজন্যই পুনরায় দুর্ভিক্ষের সূচনায় মানুষ আর দিশেহারা হয় না। কারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি এতদিনে সজাগ হয়ে উঠেছে-

> 'এদেশে বন্যা হবে, খরা হবে, দুর্ভিক্ষ হবে। মানুষ ডুববে, মরবে, না খেতে পেয়ে হাড্ডিসার হবে। এই সব ইস্যু রাজনীতির উপাদান হবে, এই সব সমস্যা নিয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা হবে, মিছিল হবে, একদল ক্ষমতায় আসবে এবং কুদ্দুস মোল্লারা ভিটে থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফুটপাতের মানুষ হবে। রাজনীতি ও জীবন নিয়ে ছিনিমনি খেলবে- কিন্তু ওরা কখনো অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারবে না।'[২১]

আত্মসত্তা অন্বেষণের এই প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করার জন্য আকস্মিকভাবে জারি হয় মার্শাল ল'। মার্শাল ল' পুনরায় আলী আহমদকে বিচলিত করে তোলে। তাই তিনি জীবনের প্রতিকল্প ও ভাষ্য খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বার বার সঙ্কট মুহূর্তে বিশ্বকবির কাছে তাঁকে ফিরে যেতে হবে। মূলত একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজসত্যের গভীর প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন আলী আহমদকে ঘটনা-প্রবাহ, সময়-প্রবাহ ও চরিত্রপ্রবাহের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন।

৩.

গায়ত্রী সন্ধ্যা (১৯৯৫)-এর দ্বিতীয় খণ্ডে চলমান জীবনচিত্র তার পরিবর্তনশীলতার অন্তর্গত বহির্গত বাস্তবতার স্বরূপের সাথে আলী আহমদের জীবনে অভিজ্ঞতার নব নব প্রান্তে উন্মোচন এবং একইসঙ্গে প্রদীপ্তর বিরুদ্ধ-সময়স্রোতের সঙ্গে দীর্ঘায়ত, জটিল ও কঠোর সংগ্রামময় জীবনের স্পর্শে হয়ে ওঠার ঔপন্যাসিক-বিবরণ কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত করে বিন্যস্ত হয়। ত্রয়ীর দ্বিতীয় পর্বের কালের ব্যাপ্তি ঊনষাট থেকে ঊনসত্তর। ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি : 'ষাটের দশক ছিলো বাঙালির জীবনে এক অভিঘাতময় সময়। একদিকে সামরিক শাসনের পীড়ন, অন্যদিকে জাতি হিসেবে বাঙালির জাগরণ- সব মিলিয়ে এক কঠিন অথচ বিশাল সময়। এ দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদে জিতেছে বাঙালি। এ জেতা নিজের স্বরূপকে চেনার বিজয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীকে এ বিজয় অর্জনের মূল্য দিতে হয়েছে আবার একটি সামরিক শাসনের

বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। এ সময়ের শব্দরূপ গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই'[২২]

বাঙালি জীবনের অভিঘাতময় সময়ের শব্দরূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে ঐতিহাসিক উপকরণের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের গ্রথিত করতে হয়েছে- ঘটনার বাস্তবতা ও কাল্পনিক বাস্তবতার ঐক্যসূত্রে। ঊনষাট থেকে ঊনসত্তর-এই এক দশক ছিল বাঙালির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা অনুসন্ধানের পথযাত্রা দুর্মর অভিজ্ঞতার কাল। 'ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙালি জাতি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানবাদী চেতনার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে।'[২৩] ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তাবিকাশের পথটি সুগম হয়। কিন্তু সামন্ত আদর্শপুষ্ট ও আমলাতন্ত্রশাসিত কেন্দ্রীয় প্রশাসন এই জাতিসত্তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করার জন্য ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন প্রবর্তন করে। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রার পটভূমিতে পাকিস্তানী সেনাতন্ত্র সৃষ্টি মৌলিক গণতন্ত্রের শৃঙ্খল সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করে গভীর সঙ্কটকালে।'[২৪] কারণ এ সময় পাকিস্তানি সামরিক শাসক দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিলসহ সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত ও সভা-সমিতি মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপের মাধ্যমে আইউব খানের সামরিক প্রশাসনিক কার্যক্রমের তৎপরতা সূচিত হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের ধর্মাদর্শ অনুযায়ী বাঙালি সংস্কৃতিতে ভারতীয় ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বাধাদান, ১৯৬২ সালে ৩০ শে জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার, তার প্রতিবাদে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানব্যাপী সভা-সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন এবং ঢাকা ও যশোরে মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি বর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এক জনের মৃত্যু ও শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনা; ১৯৬৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলনের প্রেরণাবাহী 'শিক্ষা দিবস' পালন, ১৯৬৪ সালে ৩ জানুয়ারিতে কাশ্মীরে সংঘটিত একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গার সূত্রপাত, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া, ১৯৬৫ সালে পুনরায় রবীন্দ্র-বিতর্ক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বেতার টিভিতে প্রচারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, এবং ভীতসন্ত্রস্ত স্বৈরাচারী শাসকচক্র ছয়দফার মধ্যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করে অধিকতর হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' শেখ মুজিবুর রহমানসহ সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা ও রাজবন্দিদের ওপর অমানুষিক নিপীড়ন করার ঘটনা, পুনরায় ১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা, বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের নামে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্তের উদ্যোগের ফলে ছাত্রদের ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে এগোরো দফা দাবি উত্থাপন এবং ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি 'দাবি দিবস' পালন করার সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সংগ্রামী ও সচেতন ছাত্রসমাজের মিছিলে পুলিশের নির্যাতন এবং ২০শে জানুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষকালে গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান-এর শহিদ হওয়ার ঘটনা এবং সর্বোপরি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা ও ১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুদ্দোহাকে সেনাবাহিনী দ্বারা হত্যা করার

সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানোর পর সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে শত-সহস্র মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে আকাশ-বাতাস শ্লোগানে মুখরিত করে তোলা এবং সরকারের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী কর্তৃক ৩৯ জনের মৃত্যু- সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পটভূমিতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তিদান-২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে রেসকোর্সের গণ সংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণদান ও তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলনকে শেখ মুজিব ছয় দফার সঙ্গে একীভূত করে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকে উক্ত দাবির পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের উক্ত প্রস্তাব ও দাবি গ্রহণে অসম্মত হওয়া, বৈঠকে সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় গঠনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন দাবি গৃহীত হওয়া- এক দীর্ঘ কালানুসৃত ঘটনাপ্রবাহ এবং সর্বোপরি ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সম্পূর্ণ বে-আইনভাবে আইউব খানের জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে সামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর ও ইয়াহিয়া খানের সমগ্র দেশে সামরিক আইন ঘোষণা পূর্ববাংলার ষাট দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইসব ঘটনার কালানুক্রমিকতা পূর্ববাংলার সমাজ মানসে 'সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে মানবতাবাদী জীবনচেতনা, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আস্থা মৌল প্রবণতায় পরিণত হয়। বাঙালির সহস্র বছরের ঐতিহ্যলালিত জীবনাদর্শ সাম্প্রদায়িকতা ও সামরিক অপশাসনে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হলেও সময়ের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয় এবং পরিণামে জাতিসত্তার নবজাগরণের বীজমন্ত্রে রূপ লাভ করে।'[২৫] ফলে ছাত্রসংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহকে দেখা যায় পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের পক্ষে বিভিন্নভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে। এই স্বাধিকারের সপক্ষে সমাজ-মানসের বৃহৎ তরঙ্গ এ-সময়ের অনিবার্য ও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

মূলত সেলিনা হোসেন 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'র এ খণ্ডে সমাজ অন্তর্গত মানুষের সামূহিক সঙ্কটকে আলী আহমদের অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রদীপ্তর জীবন, তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও মঞ্জুলিকার সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা, প্রতীক-বন্যার কোমল অন্তর্ময় সম্পর্কের সূত্র শিকড়ায়িত হবার ঘটনা, আবেদ আলীর নিঃশিকড়, নিরস্তিত্ব হওয়ার চিত্র, লেখক নসিবের জাতিসত্তা-আত্মসত্তা অন্বেষণে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ, মানবতার শত্রু দাঙ্গায় আমীর-ভুবনের মর্মন্তুদ মৃত্যু, জনৈক চরবাসীর শহরে হারিয়ে যাওয়া ও পরবর্তীতে কালের প্রয়োজনে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের সময় নির্মম পরিণতিলাভের প্রসঙ্গ প্রভৃতি ঘটনাই ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আর্টের প্রয়োজন সিদ্ধ করার প্রয়াস মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রদীপ্তর রিকশাওয়ালা আবেদ আলীর সময়স্রোতে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী-কন্যাকে অন্বেষণ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই-এর সূচনা। প্রদীপ্ত একদিন এই রিকশাওয়ালাকে মিলিটারির হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে প্রহৃত হয়েছিল। সেই আবেদ আলীকে প্রদীপ্ত আবিষ্কার করে ঢাকা শহরে ভাসমান মানুষ হিসেবে। যার অতীত হারিয়ে গেছে, জেল যার দীর্ঘ সময় শুধু কেড়ে নেয় নি, বিচ্ছিন্ন করেছে সুখের সংসার থেকে। এর পিছনে যদিও শ্রমজীবী মানুষের ঈর্ষার প্রতিক্রিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল তবুও তো আবেদ আলী মিস্তির মতো অন্যের সন্তানেরা মাঝে নিজের কন্যা আয়েশা-কলমীকে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল ঘটেছে অন্য। আবার জেদের সংঘাত। শেষ পর্যন্ত আবেদ আলী সামরিক শাসনবৃত্তের

শূন্য মানবিকতায় নিরস্তিত্ব হয়েছে।

নব্য-ঔপনিবেশিক সামাজিক কাঠামোয় আবেদ আলীর মতো শ্রমজীবী ব্যক্তির নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা, হাফিসুদ্দিনের লেখকসত্তার আত্মপরিচয় অন্বেষণ, জাতিসত্তা অনুসন্ধানরত প্রদীপ্তর ব্যক্তিত্বময় হয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিত পরস্পরিত হয়ে উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। আইউবি দশকের যন্ত্র-নির্ভরতা, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং প্রশাসনে সমরাস্ত্রকে শোষণের কেন্দ্রে স্থাপনকরণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বিচিত্র জিজ্ঞাসায় বিদীর্ণ করে দেয়। নগরায়ণের প্রতিক্রিয়ায় 'জীবনের দ্রুত পটপরিবর্তন, মূল্যবোধের বিপর্যয়, এবং এর ফলস্বরূপ সিনিক্যাল অবিশ্বাস, আয়রনিক শ্লেষ, আবেগ সম্পর্কে সংশয় ও অনিশ্চয়তা' [২৬] মধ্যবিত্ত শিল্পীমানসকে করে তোলে অস্থির ও দ্বন্দ্বরক্তিম। এজন্য দেখা যায় গায়ত্রী সন্ধ্যা-র প্রথম পর্বের শহিদ সাবের এ পর্বে আরো বেশি আত্মমগ্ন, বিচলিত, ভেতরের যন্ত্রণায় মথিত, আচরণে অসঙ্গত। অন্যদিকে বত্রিশ বছরের মাতৃহীন পিতৃলালিত হাফিজুদ্দিন রোমান্টিক স্বপ্নময়তায় আপ্লুত হতে চেয়েও জীবনের ও শিল্পের মাহূর্তিক চেতনায় ব্যক্তিসংকটের প্রসঙ্গে বেশি উদ্বুদ্ধ, সংশয় ক্লিষ্ট। এজন্য তার নাটকের নায়ক আত্ম-অন্বেষণের সূত্রে ফ্ল্যাশ-ফরওয়ার্ডে চলে যায় নিদারাবাদের খালে, যেখানে বিরজার টুকরো টুকরো শরীর ভেসে থাকে কালো জলে। তাঁর নায়কের এই সর্বমানবের ঐতিহ্যালোকে পরিভ্রমণ সমকালীন সমাজ বিকাশ প্রক্রিয়ার অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া। মধ্যবিত্তের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা চিন্তা, সামরিক শাসনের করালগ্রাসে পতিত মধ্যবিত্তের জীবন জিজ্ঞাসা- এক ভয়াবহ অতলান্ত তমসায় আচ্ছন্ন হয়। এজন্য নসিবের পিতৃবিয়োগোত্তর আত্ম-বিশ্লেষণ : 'সামরিক শাসনের অধীনে জীবন যাপন করলে মৃত্যু এমন অমানবিক হয়। যারা গণতন্ত্রের ছায়ায় বাস করে না, যারা স্বৈরাচারের নিপীড়নের শিকার তারা সবাই বেওয়ারিশ লাশ, এবং এই সরকারের অধীনে প্রতিটি মানুষই একজন নপুংসক নাগরিক। সে কারণে আমি নিশাতের প্রেমের উপযুক্ত নই এবং এই কারণে আমি বাবার জন্য কাঁদতে পারছি না। কারণ আমার জীবনের মৌলিক শর্তগুলো সামরিক শাসনের যাঁতাকালে খারিজ হয়ে গেছে। আমি কি মানুষ? আমি কেমন করে ভালো বাসবো? কেমন করে কাঁদবো?'[২৭]

স্বৈরবৃত্ত সময়ের পরিমণ্ডলে একজন সচেতন শিল্পীর এই আত্মযাতনা ষাটের দশকের স্ফীতকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব অহংকারের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথাচিত্র হলেও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি অন্যত্র প্রসারিত। পিতাকে কবরস্থ করার পর নসিব হাফিজুদ্দিন এজন্য কবি অসীম রায়হানে পরিণত হয় এবং আত্মগ্ন চেতনায় সে পরিভ্রমণ করে পুশকিনের শহরে। ষাটের নাট্যকার-কবি প্রমুখ সকল শিল্পী আত্মরতি, আত্মপলায়ন, আত্মহনন, আপোসকামিতা ও আত্মখনন প্রভৃতি উপাদানে সমাধিত হয়েছিলেন মূলত যুগের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। তবে তাঁরা যে '৬২ এর ছাত্র আন্দোলনের নব অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাও কম সত্য নয়। সেলিনা হোসেন এই সময়ের সঙ্কটাকে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন তাঁর ত্রয়ীতে। নসিবের চেতনাময় অনুসন্ধান : 'ও ভেবে পায় না ক্রোধ কার ওপর। যারা সামরিক শাসনকে মেনে নিয়েছে তাদের ওপর নাকি ঐসব নপুংসক নাগরিকদের ওপর, যারা শুধু ঘুমুতে চায়, ক্রোধ বাড়তে থাকলে ওর মাথার মধ্যে একটি রাজপথ জেগে ওঠে, দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। স্বাভাবিক জন্মের মানুষগুলো জারজ হয়ে গেছে ওদের দিয়ে আর কিই বা হবে, ও ভাবতে ভাবতে টেবিলের ড্রয়ার খোলে। রঙিন মাছিটি মরে পড়ে আছে। ওর ডানার উজ্জ্বল রঙে তখনো সোনালী আভা। ও মস্তিষ্কের রাজপথের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

শূন্যে হাত ওঠায়, বলে, আমি শত শত জারজ সন্তান চাই, যাদের সামাজিক স্বীকৃতি নেই। যাদের কেউ গণ্য করে না, যারা সমাজের অপাংক্তেয় প্রাণী। অথচ তাদের আজ বড়ো বেশি প্রয়োজন, তারাই একটা বড়ো পরিবর্তন আনতে পারবে।'[২৮]

যাদের সামাজিক স্বীকৃতি স্বৈর শাসকের কাছে অর্থহীন, সেই শ্রমজীবী, পাটকলের শ্রমিক মনু মিয়ার মতো মানুষের প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হয় নসিব। তাই সে উপন্যাস লেখার বিষয় নির্বাচন করে নায়কের অস্তিত্বের প্রশ্ন। অস্তিত্বের প্রশ্নটি ষাটের দশকের ঔপন্যাসিকদের শিল্পচিত্তকে আলোড়িত করেছিল রাজনৈতিক ঘটনার জটিল ও দ্বন্দ্বময় চারিত্র্যের জন্য। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই দাঙ্গাই প্রথম প্রমাণ করলো যে কেবলমাত্র হিন্দু নয়, বাঙালি মুসলমানরাও এই রক্ত খেলায় বলি হতে পারে। কারণ বিভাগোত্তর কালে ভারত থেকে আগত বিহারি মুসলমানরা এই দাঙ্গার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে : 'এই দাঙ্গার পশ্চাতে ছিলো মোনায়েম খাঁর শাসনাধীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার। সরকারি ইঙ্গিত পেয়ে বিহরিরা দাঙ্গা শুরু করে।'[২৯]

এজন্য 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই'-এ দেখা যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী, গৃহহীন ভুবন কেবল এই দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায় নি, প্রাণ দিতে হয়েছে ভুবনের বন্ধু আমীরকেও। কারণ বিহারিরা বলেছিল : 'মুসলমান কা দোস্ত হিন্দ্ তুমি ভি কাফের হো।'[৩০] ভুবনের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের গল্পের শ্রোতা, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমীরের 'আমি মুসলমান, দোহাই লাগে তোমাদের, আমি মুসলমান' রক্ত উন্মত্ত দাঙ্গাকারীদের কর্ণে প্রবেশ করে না, তারা তখন হা-হা হাসিতে পৌষের ঠাণ্ডা দিনটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। রেল ক্রসিংয়ের ওপর ধরাশায়ী করে আমীরের শরীরটা ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে- 'রক্ত ঝরে মুসলমানের হাতে মুসলমানের রক্ত-রক্ত ঝরে। রেল ক্রসিংয়ের ওপরের এবড়ো থেবড়ো জায়গাটুকু ভিজে যায়। ও নেতিয়ে পড়ে-তখন ও শুনতে পায় না সেই ঘৃণিত উচ্চারণ, শালে কুত্তে কি বাচ্চা। তখনও আর জানতে পায় না যে দূর থেকে ছুটে আসছে নিরাপত্তা বাহিনী। পালিয়ে যাচ্ছে গুণ্ডারা। দাঙ্গা বিধ্বস্ত শহরটা থমথমে।'[৩১] ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম উন্মোচনে এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাঙালি অস্তিত্বের বিনাশী দিকই কেবল বিন্যস্ত নয়, একইসঙ্গে এই দাঙ্গা প্রতিরোধে অ-সাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী বাঙালির প্রচেষ্টা-উদ্যোগও উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য এও সত্য যে এই দাঙ্গা-প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আত্মশক্তি ও সংঘশক্তির প্রতি বাঙালির আস্থা আরো দৃঢ়তর হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশবাদী পুঁজিতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিষয়। এজন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে বেতার যন্ত্রের লাইসেন্স গ্রহণ করতে দেখা যায় ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৫৩ জনকে। 'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি, অধিকার চেতনা এবং ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্বের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচার মাধ্যমের এই বিস্তারে বাংলাদেশের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের প্রথাগত জীবনচেতনার পটভূমিতে ব্যাপক আলোড়ন সূচিত হয়। ফলে, তাদের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা সমাজকাঠামোর মৌল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিকশিত হতে থাকে। ধর্ম কিংবা নিয়তিনির্ধারিত বিশ্ববিধানের প্রচল ধারণা মানুষের কাছে মূল্য হারিয়ে ফেলে। স্থবির বর্তমানকে অতিক্রমণের প্রত্যাশায় তারা জীবিকার সন্ধানে হয় নগরমুখী।'[৩২]

এই নগরমুখী হবার বিষয়টি ধারণ করে সেলিনা হোসেন 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই'-এ ফর্মের অনিবার্যতায় তাই নসিব লিখিত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশখালী নদীর চরবাসী

শ্রমজীবীর নগরমুখী হয়ে দাবি আদায়ের প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হবার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নসিবলিখিত উপন্যাসে থাকে চরবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একমাত্র সন্তানের নগরে গিয়ে না ফিরে আসার কাহিনি। আর থাকে, বৃদ্ধার নাতির নগরে গমনের পরবর্তী ঘটনায় পিতাকে শ্রমিক নেতা হিসেবে আবিষ্কার করার নাটকীয় বিবরণ। 'ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মুই বাজানের ধারে যামু। মুইও (বুড়ো) মোর পোলার ধারে যামু। লও মোরা বেবাক্যে শহরে মেলা করি।'[৩৩]

কিন্তু দাদা-দাদীকে রেখে তিতুমীর একদিন ঢাকামুখী লঞ্চে উঠে বসে। ঢাকায় তার প্রথম অভিজ্ঞতায় পকেটমারদের হাতে পড়লেও শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করে সে এবং পিতা মনুমিয়ার সাহচর্যে আসে। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মনুমিয়ার কাছে এখন বিশখালী চর কেবল স্মৃতিচারণের মধ্যেই বলয়িত। তার ব্যস্ততা এখন ন্যায্য দাবি আদায়ের ব্যস্ততা। এজন্য নান্টু ওরফে তিতুমীরের 'বাবা তোমার এসো কি কাজ?'-প্রশ্নের উত্তরে সে বলে : 'আগামী সাতই জুন সারা দেশে হরতাল ডাকা হয়েছে নান্টু। তার জন্য কাজ করতে হচ্ছে। ছেলেটি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনু মিয়া বলতে থাকে, ক'দিন আগে 'খাদ্য দাবি দিবস' পালন করা হয়েছে। মানুষ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে নান্টু। শ্রমিকরা এর আগে কখনো এমন করে আন্দোলনে আসে নি। এখন আমাদের সময়। আমরা এই অবস্থার শেষ দেখতে চাই।'[৩৪]

তাই ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে হয় বিশখালী নদীর চরে ছেলের দাদার কাছে। কিন্তু চরের ফসল ও জমি দখল সংক্রান্ত তুমুল মারামারির ভেতর ছেলেটির স্বপ্ন ছুটে আসে ঢাকা নগরীতে পিতার কর্মকাণ্ডের দিকে। চরের ন্যায্য দাবি নিয়ে মারামারিতে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে দাদার মৃত্যু অন্যদিকে পিতার সাতই জুন নিখোঁজ হবার ঘটনায় তিতুমীর নিঃশিকড় হয়ে যায় ঢাকা শহরে। প্রদীপ্ত চৈতন্যে তিতুমীর : 'নসিব এর উপন্যাসে বলেছে সময়টা কিশোর তিতুমীরের। কারণ লড়াইতে ওর দাদা মরেছে, বাবা মরেছে। তাই সময়টা তিতুমীরেরই হয়। তাহলে ওদের কি এমন জীবন সামনে? লড়াইয়ে হারিয়ে যাবে দাদা, বাবা? কয় পুরুষ লড়তে হবে আমাদের? প্রদীপ্ত বিড়বিড়িয়ে নিজেকে বলে।'[৩৫]

তবু এই ঢাকা শহরে সে টুম্পাদের বাসায় গৃহভৃত্যের কাজ পায়। টুম্পা'র 'আমার বাবা-মা কে?'-এ প্রশ্নের জবাব সে কোথায় পাবে? প্রদীপ্ত ও মঞ্জুলিকাকে গল্প বলতে বলতে তিতুমীর যখন প্রদীপ্তর 'কোথায় থাকবি?' প্রশ্নের উত্তরে তার সিদ্ধান্তের কথা জানায় : 'রাস্তার ছেলে রাস্তায়। ছোটখাটো কতো কাজ জুটে যায়। কাজের কি অভাব আছে? প্রদীপ্ত ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ঠিক বলেছিস। এখনতো শহরটা তোর আর আমার। অর্থাৎ মিছিলের। আমাদের কতো কাজ। নারে?'[৩৬]

এই মিছিলের শহরে একদিকে প্রদীপ্ত-মঞ্জুলিকা অন্যদিকে প্রতীক-বন্যা নিজের অস্তিত্বের সংজ্ঞার্থ খুঁজতে থাকে। 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের জাফর-আঞ্জুমের মতো সেলিনা হোসেন এই জুটি দুটিকে একদিকে অতি-রোমান্টিক প্রেমানুভূতি অন্যদিকে আবেগদীপ্ত সংগ্রামমুখীনতায় বিন্যস্ত করে ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। প্রতীকের হয়ে উঠার আখ্যান ও আন্দোলনের অনিবার্য স্রোতে আত্মলীন হওয়ার ঘটনা, প্রদীপ্তর চেতনাস্তরের ক্রমরূপান্তর ও রাজনীতিবোধের ঋদ্ধতা এবং আলী আহমদের দীর্ঘ সময়প্রবাহে স্মৃতি-অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণায় অবসন্ন হতে থাকা, সর্বোপরি প্রতীক-প্রদীপ্তর মা পুষ্পিতার দীর্ঘদিনের সংসার আগলে রাখার প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে একটি পরিবারের অন্তরঙ্গ চিত্র রাজনৈতিক সমাজ-সময় বৈশিষ্ট্যের

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রূপায়িত। এজন্য 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' প্রথম পর্বের (১৩ পরিচ্ছেদ) মতই দ্বিতীয় পর্বে শাহবাগ মোড়ে উদ্দীপ্ত ভাষা শহীদ অহিউল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বারবার অহির এই সাক্ষাৎ লাভ ভাষাশহীদদের স্বপ্ন-বাস্তবায়নকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য উপন্যাসে অনিবার্য হয়ে এসেছে। এজন্য আলী আহমদের পরিবারে উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ বিবরণ রেখায়িত হয় এভাবে : 'প্রতীক চেঁচিয়ে ওঠে, অহি? শহীদ অহিউল্লাহ। আলী আহমদ, এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে বলে, নেতারা পাকিস্তানি ভাষার স্বপ্ন দেখলে অহি চুপ করে থাকবে ভেবেছিস? ওরা তিনজনে সোজাসুজি আলী আহমদের দিকে তাকায়। দেখতে পায় আলী আহমদের চেহারায় জ্যোতি। আলী আহমদ ওদের দিকে তাকায়। দেখতে পায় ওদের চেহারায় জ্যোতি। ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। দেখতে পায় প্রত্যেকের চেহারায় জ্যোতি। অনেককাল পর এই পরিবারের প্রত্যেক চেহারা একরম হয়ে ওঠে।'[৩৭]

অথচ এই পরিবারে দেশভাগজনিত কারণে রয়েছে উদ্বাস্তু হবার যন্ত্রণা। রয়েছে প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, মেলবার সাধনা ও মিলতে না-পারার অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিকের বিবরণ : 'আলী আহমদ পুষ্পিতার মুখে দিকে তাকায়। দেখতে পায় মহানন্দার আঁকাবাঁকা স্রোত, দেখতে পায় রিফুউজির যন্ত্রণা, দেখতে পায় নিজ বাসভূমি খুঁজে বেড়ানো মানুষের কান্না। পুষ্পিতা মৃদু স্বরে বলে, কি দেখছো? তোমাকে, তুমিই আমার স্বদেশ পুষ্পিতা। জেনে রেখো এটা কোনো অস্থির সময় নয়, এটা হয়ে উঠার সময়। স্থির হবার আগের সময়। এটা আমাদের বোধের সময়। বলতে বলতে আলী আহমদ ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের মধ্যে মাথা রাখে। পুষ্পিতার শরীর শিউরে ওঠে। মনে হয় এ যেন সেই যৌবনের মানুষটি, যাকে ঘিরে প্রচণ্ড মাদকতার শেষ ছিলো না- যার সঙ্গে স্বপ্ন দেখার শুরু। পুষ্পিতা আলী আহমদের মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে সে মাথার ওপর মুখ রাখে।'[৩৮] হয়ে ওঠার সময়, বোধের সময় বলেই প্রদীপ্তও 'নতুন নতুন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন শহরটা' বদলে যাচ্ছে দেখতে পায়। নতুন গভর্নর (১৯৬৯) দায়িত্ব গ্রহণ করলে প্রতীক হাসতে হাসতে বলে : 'খুকুমণির পুতুল খেলা। একজনকে ধরেটরে বর সাজিয়ে দিলেই হলো, আর কি?'[৩৯] অন্যদিকে স্থির হবার সময় বলেই হয়তো ২৫শে মার্চ মঞ্জুলিকা-প্রদীপ্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাই রাত সোয়া নয়টায় বেতার ভাষণে প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারির সংবাদ প্রদীপ্তর বিবাহবাসরের আয়োজনকে ম্লান করতে পারে না। প্রতীকের গাঁদা ও কাঠমল্লিকায় তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ইতিহাসের সত্য বড়ো নির্মম। আবার আলী আহমদকে যন্ত্রণাদগ্ধ হতে হয়। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' -তিন-এর সূচনা এই আলী আহমদের অসুস্থতার ঘটনা দিয়েই।

৪.

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ীর তৃতীয় খণ্ডের পটভূমি ঊনসত্তর থেকে পঁচাত্তর। বাঙালির জীবনচিত্রণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষেপণ রয়েছে এই পর্বে। কারণ তাঁর ভাষায়–

> 'এ সময়ে অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশের-এ সময় বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল-তারা অর্জন করেছে সব ধর্মের মানুষের জন্য একটি ভূখণ্ড, যেখানে প্রতিদিনের গায়ত্রী সন্ধ্যায় মানুষের মঙ্গল ধ্বনি বাজে। এ ভূখণ্ড স্থির করেছে একটি জাতির স্বপ্নসাধ।'[৪০]

বাঙালি জাতির স্বপ্নসাধ পূরণের জন্য তাকে অর্জন করতে হয়েছে আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ঘাত-প্রতিঘাতের দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে জাতির জীবনে ঘটেছে অনেক অশ্রুমাখা ঘটনা। বিচ্ছিন্ন, রিক্ত, শূন্য হয়েছে পারিবারিক সুখের স্মৃতি আবেষ্টনীর তিথিডোর। কারণ কালের প্রবাহ ছিল বিপ্লবের সন্ধ্যাহ্নিকে প্রস্তুতিপর্ব। সময় ছিল যুদ্ধের, স্বাধিকার-স্বাধীনতা অর্জনের বেদমন্ত্র উচ্চারণের। তাই বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছে একই পতাকাতলে। স্লোগান দিতে হয়েছে 'জয়বাংলা' বলে।

মূলত 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' : তিন (১৯৬৬)-এর সময় পর্বে রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার দীর্ঘ সারণি। ১৯৬৯ সালের সামরিক জান্তার বেতার ভাষণের পর ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের' স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচি, সামরিক আইন অক্ষুণ্ন রেখে ইয়াহিয়া খানের ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৩৩০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করার আদেশ ঘোষণা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রতিবাদে ৬ ও ১১ দফা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭ এপ্রিল (১৯৭০) 'দাবি দিবস' পালন, ১৭ সেপ্টেম্বরের পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চলের ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস, ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচন, নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং এই নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লিগ তথা বাঙালি জাতির বিপক্ষে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর গভীর ষড়যন্ত্রজাল সৃজন ও নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সরকারের দীর্ঘসূত্রতা- পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বাধীন বাংলাদেশের মতবাদ ও প্রত্যাশার সংগ্রামদীপ্ত ও প্রাণময় করে তোলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামের প্রস্তুতি ও ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যদিকে এই ঘোষণার পরপরই জাতীয় পরিষদ বৈঠক বাতিলের সংবাদে সারা পূর্ববাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ ঘটে। এই গণ-অভ্যুত্থানকে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক দক্ষতায় একটি অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করে। ফলে 'গণআন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে প্রদেশের সমগ্র প্রশাসন কার্যত এক বিকল্প সরকারে পরিণত হয়। তৎদৃষ্টে সামরিক জান্তা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে একমাত্র চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমেই বাঙালিদের এই নতুন আত্মপ্রত্যয় প্রতিহত করা সম্ভব।'[৪১] ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে অবশেষে পাক-সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের উপর নিষ্ঠুর পৈশাচিক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'পঁচিশে মার্চের ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল জাতি প্রথমত প্রতিরোধ গড়ে তুললেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে।'[৪২] পরবর্তী সময় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধশক্তি, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অনুচর ও সহযোগী শক্তি রাজাকার, আলবদর, আলশামস ১৪ই ডিসেম্বর সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সহায়ক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্যে তারা সাধারণ ক্ষমা লাভ করে। নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অত্যাচারিত, গৃহচ্যুত, স্বদেশে উন্মূলিত ও বিদেশের শরণার্থী জনগোষ্ঠী এবং সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধা তরুণ সম্প্রদায়ের যুদ্ধকালীন প্রত্যাশার অচরিতার্থতা যুব মানসকে হতাশা

ও ব্যর্থতাবোধের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এজন্য ১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লিগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে করে তোলে ঝঞ্ঝামুখর। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান। এই সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন, মার্কিন পুঁজিতন্ত্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য '১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্বতৈলসঙ্কট, বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি, সদ্য স্বাধীন দেশের অস্তিত্বমূলে আঘাত হানলো। ফলে, দুর্ভিক্ষের পদপাতে বিপর্যস্ত হলো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জনজীবনের নব উদ্যম ও প্রাণশক্তি। জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জটিল পক্ষ বিস্তার বাঙালি জাতিসত্তার প্রাথমিক অস্তিত্বকে করে তুললো সঙ্কটাপন্ন। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের যৌথ প্রচেষ্টা নব্য স্বাধীন দেশের অস্থির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনযন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলতে অনেকাংশে সমর্থ হলো। পাকিস্তানি হানাদারদের ফেলে যাওয়া এবং মুক্তিযোদ্ধার অসমর্পিত আগ্নেয়াস্ত্র হতাশাগ্রস্ত বিভ্রান্ত তরুণ সম্প্রদায়কে করল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত।'[৪৩] (এই হতাশাগ্রস্ত বিভ্রান্ত তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' তিন-এর প্রতীক।) এছাড়া ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া, ১৯৭৫-এর ৬ জুনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নতুন সংগঠন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লিগ' বা 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা এবং অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের বাকশালে যোগদানে বিরত থাকা, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় সংকোচনে সামরিক বাহিনীর বিরূপ মনোভাব পোষণ- সব মিলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে এক প্রতিবিপ্লবী, সেনা অভ্যুত্থানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার ঘটনা- ১৯৭১ থেকে '৭৫ এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি।

নির্দিষ্ট বাস্তবতায় সত্যকে অতিক্রম করে ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব লুকিয়ে আছে। সেজন্য ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আলী আহমদ এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদ বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সত্যকে নিজেদের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছিলেন বলেই তাঁদের পরিণতি এত নির্মম, এত মর্মন্তুদ। এজন্য তাঁরা পরিণত হয়েছেন প্রতীকে। কারণ স্মরণীয় : 'অধীতবিদ্যা, সাংস্কৃতিক মান, শেকড় সন্ধান, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিচিত্র প্রবণতার সংশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজে গড়ে তোলে বরং বলা ভালো নিজেকে যোগ্য করে তোলে ইতিহাসের সত্যকে নিজের মধ্যে মূর্ত করে তুলতে। আর তখনই একজন ব্যক্তি পরিণত হয় ইতিহাসের উপাদানে-বিকাশের একপর্যায়ে সে ইতিহাসের নির্ধারকেও পারিণত হতে পারে, কেননা আপাতদৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তি মনে হলেও চলমান বাস্তবতার মূর্ত প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে সে।'[৪৪]

দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতার যোগফল ঘটেছে গায়ত্রী সন্ধ্যা: তিন-এ। এজন্য সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় আলী আহমদের চেতনাস্রোত : 'আসলে অধিকার আদায়ের জন্য আমার ক্রোধ আমাকে জাগিয়ে তোলে। সেজন্য আমি মিছিলের মানুষ হই। উনসত্তরের মিছিল দেখেছি কি দীর্ঘ। মিছিলের মাথা কুর্মিটোলা পৌঁছে গেলে লেজ থাকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সেনাছাউনির অস্ত্রধারী সৈনিকরা সে মিছিল ঠেকাতে পারে নি।'[৪৫]

ভাষা আন্দোলনের মিছিলের লোক হয়েও তাই আলী আহমদের বন্ধু অবসর গ্রহণকারী পেনশনভোগী তাহের সাহেবকে পরিবারের স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতা আনতে না-পারার কারণে অবহেলিত হতে হয় স্ত্রী-পুত্রের দ্বারা। এজন্য মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তে চিৎকার করে স্ত্রী আমেনা বেগমকে তাহের বলেছেন : 'সারাজীবন কেবল বাড়ি বাড়ি করলে। ঢাকা শহরে কতো লোকেরই তো বাড়ি নেই। আমাদেরও নেই। তাতে হয়েছেটা কি? আমাদের যে সম্পদ আছে তো একটা জাতিকে বড় করে, মহান করে। তুমি আর তোমার ছেলে মেয়েরা এসব বুঝবে না। তোমাদের কাছে আমি একজন ব্যর্থ মানুষ। এজন্য আমার নিজের কোনো লজ্জা নেই।'[৪৬]

একুশের স্মৃতি নিয়ে যে মানুষটি মারা যান তিনি ইতিহাসের বস্তু নন কিন্তু জীবনের কাছে হেরে যাওয়া পরিবারের কাছে অবাঞ্ছিত হওয়া এই মানুষটির মৃত্যুর পর আলী আহমদ ভেবেছেন : 'ঐ আবেগের (একুশের) দিকে ও (সামরিক শাসক) তাকে করে রেখেছে রাইফেলের নল। কিন্তু তাহেরের জন্য আমরা আছি, আমরা সাধারণ মানুষেরা। আমরা ডাক দিলে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসবে-শহরজুড়ে একটা জানাযা হতে পারে তাহেরের জন্য।'[৪৭]

শহরের দূরে যে গ্রাম রয়েছে সেখানেও যে শ্রেণিশত্রু 'ঘায়েলের আন্দোলন চলছিল তার দৃষ্টান্ত উপন্যাসে পাওয়া যায় সোনাখালি গ্রামের কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের করুণ পরিণতির ঘটনা থেকে। প্রদীপ্ত-মঞ্জুলিকার সোনাখালি গ্রামে, মঞ্জুলিকার চাচা কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের বাড়ি গমন এবং গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রদীপ্তকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এজন্য বিমলের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে : 'গুপ্ত হত্যা করে বড়ো কিছু করা যাবে এমন বিশ্বাস আমার নেই।'[৪৮] প্রদীপ্তর এই উক্তি তৎপূর্বে শেখ মুজিবুরই ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভাষণের এক পর্যায়ে ব্যক্ত করেন: 'অতি বিপ্লবী কয়েকটা শ্লোগান বা রক্তের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার শিভালরির মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিলে সে ডাক আমিই দেবো।'[৪৯] উক্ত উক্তির প্রতিধ্বনিমাত্র। সিরাজ সিকদারের 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নামে গোপন বিপ্লবী পার্টির কর্মকাণ্ড তাই তার দৃষ্টিতে আদর্শগত পথ নয়।

ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে প্রদীপ্ত নসিবকে নিজের স্ত্রী নাসিমার হন্তারক হিসেবে আবিষ্কার করে। কিন্তু প্রদীপ্ত নসিবকে একজন পরাজিত মানুষ হিসেবে দেখতে চায় নি। বন্যাও তো চায় নি তার মা জুলেখার মৃত্যুর পর তার পিতা মতিউর পুনরায় বিবাহ করুক। অথচ তা মতিউর সাহেব করেছেন। আসলে স্বৈরাচারের শাসনামলে মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির কোনো সঙ্গতি তখন হচ্ছিলো না। তাই মানুষ একাকী, নিঃসঙ্গ ভাবনায় মগ্ন হয়েছে। অবশ্য এও সত্য যে ব্যক্তি নয় সামষ্টিক জীবন জিজ্ঞাসায় প্রত্যেকটি সামাজিক ব্যক্তিত্বই সঠিক সময়ে সঠিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত ছিল।

এজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হয়েছে বিচলিত, ছুটে গেছে গ্রামে, দেখতে পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার নির্মম দৃশ্য। আলী আহমদের দৃষ্টিকোণ থেকে: 'বলতে বলতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্যাগটায় একটা লাথি দেয় প্রতীক। তারপর ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। কালো পাঁশুটে হয়ে যাওয়া প্রতীক এবং ওর বয়সী আরো অসংখ্য ছেলেমেয়ে নিজেদের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে ছুটে গেছে বিপন্নদেশবাসীর কাছে। খাবার দিয়েছে, শুশ্রূষা দিয়েছে, সান্ত্বনা

দিয়েছে, বিনিময়ে অর্জন করেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বোধ। বড়ো বেশি মাটি থেকে পাওয়া এই চেতনা, মূলের সঙ্গে যার যোগ এই চেতনা ওদের নিয়ে যাবে আরো গভীরে। আর পিছু হটা চলবে না।'[৫০]

ঢাকার বাইরের ঘটনায় প্রতীক যেমন বদলে যায়, প্রদীপ্তও তেমনি সৈয়দপুরে, মঞ্জুলিকার পিতা ও অন্যান্যদের পৌঁছে দিয়ে, সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপটি আপন উপলব্ধিতে আঁচ করতে পারে। সমাজ জীবনে বাস্তবতার অনিবার্যতায় সৈয়দপুর জংশনে মঞ্জুলিকার পিতাকে বদলি হয়ে যেতে হয়। এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য সেখানকার রূপান্তরধর্মী সামাজিক অবস্থা যা ঔপন্যাসিক একজন খ্রিস্টান ফাদারের অভিজ্ঞতায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়: 'এখন পর্যন্ত এই শহরটা বদলে যাওয়া আমার জন্য দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু বিহারিদের সামলাবে কে? একে তো উদ্বাস্তু, (৪৭-এর পরে পাকিস্তান থেকে আগত) তারপর অসহিষ্ণু, অবিনয়ী এবং একরোখা, কথা শোনানো মুশকিল।'[৫১]

প্রদীপ্ত সৈয়দপুরে ইতিবৃত্ত শোনে আর অবাঙালি বিহারিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের আদর্শগত চেতনার নবপ্রান্তে উত্তীর্ণ হয়। শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চক্রান্ত তার দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্টতর : 'মনে হয় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব শুধু বাঙালিদের জীবনে অর্থহীন হয় নি, বিহারিদের জীবনেও অর্থহীন হয়ে গেছে। ওরা এখন মুসলমান নয়-ওরা একদল বাঙালি, বিহারি। একই ধর্মের লোকের মধ্যে ভেদ তৈরি করেছে, শোষণ করার কৌশল উদ্ভাবন করেছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।'[৫২]

উপরন্তু প্রদীপ্তর মানসিকতায় এক বিপরীত ঘটনার অভিঘাতে চিন্তার রূপান্তর ও আশঙ্কার উদ্ভব ঘটে: 'বিদায় নেবার আগে মেহেদী বলে, আপকা নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। /প্রদীপ্ত আহমেদ।/এইটা কেমন নাম আছে ভাইসাহাব?/বাংলা নাম।/আপনি তাহলে বাঙালি, মুসলমান না।/আমি বাঙালি এবং মুসলমান।/তা কেমন করিয়া হয়?/ আপনি কি?/আমি মুসলমান।/আপনি বিহারি। মুসলমান না।/কি বলিলেন? মেহেদী হাসান চটে ওঠে।/যেমন করিয়া আপনি বিহারি ও মুসলমান, তেমনি করিয়া আমি বাঙালি ও মুসলমান বুঝিলেন।'[৫৩]

বিহারিদের এই খণ্ডিত চিন্তার জন্য দাঙ্গার সময় প্রাণ দিতে হয় আমীর সাহেবকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত ও মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় সপরিবারে মঞ্জুলিকার পিতাদের। কিন্তু ঊনসত্তর সালের আগে বিহারিদের বিকৃত চিন্তাস্রোত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে আরো তীব্রতর। এজন্য পুলিশ প্রশাসনও বিহারীদের অকল্পনীয় অবিচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

যে রাজনীতি বাঙালি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তঃশীল আকাঙ্ক্ষা ও কর্মধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উত্তরণের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তাকেই নিস্তব্ধ করে দেবার জন্য শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চের নির্মম আক্রমণ। অথচ মানুষ মুক্ত হবার প্রেরণায়, মুক্ত আকাশের আকাঙ্ক্ষার অর্গল ভেঙে বেরিয়ে আসে এই আঘাত ও মৃত্যুর মাঝ থেকেও। তাই নসিব জেলমুক্ত হয়ে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। মঞ্জুলিকা মা হয়, প্রতীক গেরিলা যুদ্ধের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। প্রতীকের প্রেমিকা বন্যা হারিয়ে যায় শহর থেকে গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার সময়। প্রদীপ্ত যুদ্ধে গিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে। আর দেশের স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে আলী আহমদকে দিতে হয় নিষ্কলুষ প্রাণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষণের নির্মম পরিণতি। অথচ এই মানুষটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের মতই

সোভিয়েত বাহিনীর জয় দেখার ব্যাকুলতাকে ধারণ করেছেন, স্বাধীন মাতৃভূমির স্বপ্ন লালন করেছেন কিন্তু বিজয়ী বাঙালিকে শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে পারেননি। মঞ্জুলিকার দৃষ্টিকোণ থেকে আলী আহমদের স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে ধৃত হবার বিবরণ নিম্নরূপ : 'অজেয়কে পুষ্পিতার কোলে দিয়ে মঞ্জুলিকাও দৌড়ে নামে, দেখে মিলিটারির জিপে চলে যাচ্ছে আলী আহমদ-গাড়িতে আরো দু'তিনজন চোখ বাঁধা লোক বসে আছে। মঞ্জুলিকার পা কাঁপে থরথর করে। ও দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নেয়। ওর চোখের সামনে মহানন্দার বিশাল ঢেউ গড়িয়ে আসতে থাকে- দেখতে পায় ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে নৌকা, সেই নৌকা মুছে দিচ্ছে একটা দেশের সীমান্ত, মুছে যাচ্ছে ঘরবাড়ি গাছপালা, মানুষ-ফেলে আসা ঘর গেরস্থালি। কতো অসংখ্যবার এ দেশে আসার গল্প করেছে পুষ্পিতা-ভারত থেকে তাড়া খেয়ে এসে উদ্বাস্তু জীবনে বেদনা নিয়ে কাটিয়েছে এতোগুলো বছর, এখন অপরাধ বাঙালি হওয়ার-বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার। কেন চোখ বেঁধে নিয়ে গেলো? মেরে ফেলবে? কোনো ব্রিজের নিচে পাওয়া যাবে তার লাশ? কেঁপে ওঠে মঞ্জুলিকা।'[৫৪]

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' : তিন-এর দশ পরিচ্ছেদের পর ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাঙালি জীবনের যন্ত্রণা, স্বজন হারানোর বেদনা, বধ্যভূমিতে স্বজনের জন্য মর্মন্তুদ হাহাকার, প্রদীপ্ত-মঞ্জুলিকার সাংসারিক দ্বন্দ্বময় রূপায়ণ, প্রতীকের প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হওয়ার ঘটনা এবং সর্বোপরি ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রথাগত সমাজস্রোতকে অস্বীকার করে নতুন বোধে উত্তীর্ণ হবার চিত্র সেলিনা হোসেনের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়েছে। যে নারীসমাজ ৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও আশ্রয় দিয়ে ইতিহাসের মহান দায়িত্ব পালন করেছিল, সেই নারী সমাজের একজন বাসন্তী, একজন আসমা, একজন নামহীন নারী '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ নিতে গিয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়-'গ্রাম না থাকলে তোমার নাম তো রিলিফের তালিকায় উঠে নি। তোমাকে রিলিফ দেয়া হবে না।/হবে না? চেঁচিয়ে ওঠে আসমা।/যাও সরো। পেছনের জনকে আসতে দাও।/কেন সরবো? আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে? একসময় তো ছিলো। আমার নদী আছে, যে নদী আমার গ্রাম খেয়েছে। আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে? আমার ভেড়ি বাঁধ আছে। বাঁধের ওপর আমরা ঘর তুলেছি। আসমা প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, গ্রাম নেই তো কি হয়েছে, আমার নদী আছে, নদীর নাম তিস্তা।/কে একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। ও রুখে দাঁড়িয়ে বলে, আমার গ্রাম নেই তো কি হয়েছে, আমার তো দেশ আছে।... আমার যে গ্রাম নাই। নদী আমাদের গ্রাম ভেঙে নিয়েছে, আমাদের কি দোষ?'[৫৫]

শুধু আসমা নয় সর্বস্তরের বাঙালিই এই নির্মম ইতিহাসের সম্মুখীন হয়েছে একদিন। মঞ্জুলিকা যে নৌকার নদীস্রোত উপচিয়ে বেয়ে চলার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই নৌকা ও নদীর এক অর্থে মৃত্যু ঘটে ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। আসমা শরীর বেচে পরিবারের খিদা মেটাতে চেয়েছিল। কিন্তু আসমার এই সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে যাওয়া ও নিঃশিকড় হবার কাহিনি বড়ই মর্মান্তিক। ঔপন্যাসিক সাংবাদিক প্রদীপের দৃষ্টিকোণ থেকে আসমা চরিত্রকে দেখালেও মূলত যুদ্ধোত্তর গ্রামে যে চিত্রটি আমরা এর থেকে পাই তা তৎকালীন 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র দল-উপদলসমূহের তৎপরতা, প্রশাসনযন্ত্রের বিচক্ষণতার অভাব, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ আদর্শদ্বন্দ্ব, জাতীয় জীবনের সীমাহীন অস্থিরতার কারণেই' অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এজন্য ফটোগ্রাফার মাহবুবের স্বীকারোক্তি-'বাসন্তীর ছবি তুলেছিলাম, পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে জাল পরিয়ে।

মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম।'[৫৬] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ্তর ভাবনাস্রোত অন্যত্রগামী : 'একটি মেয়ের দারিদ্র্যের সুযোগে কেন তার নারীত্বের এই অবমাননা? একটি স্বাধীন দেশে এই কি তার প্রাপ্য ছিল?'[৫৭]

তাই ১২ পরিচ্ছেদের শেষে সর্বজ্ঞ লেখকের ভাষ্য : 'সব দেখেশুনে ঢাকা ফেরার সময় প্রদীপ্তর মনে হলো সাধারণ মানুষের প্রতি সরকার এবং বিরোধী দল কেউই আন্তরিক নয়। ওরা নোংরা রাজনীতিকে ন্যাংটো শরীরে জালের মতো জড়ায়। জালের ফুটোয় অব্রু ঢাকে না। তবু ওটা ওদের পরতেই হয়।'[৫৮]

উপন্যাস আখ্যানের তেরো পরিচ্ছেদে ঘটনার দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রদীপ্তর জীবনের মহাকাব্যিক সময়ের আয়তনের অভিজ্ঞতা, প্রতীকের বিপ্লবের দায়ে জেলে যাওয়া, মঞ্জুলিকার খারাপ সময়ের অস্বস্তি চেতনা, পুষ্পিতার নিঃস্ব, অসহায় মূর্তি এবং পশ্চাৎপটের ঐতিহাসিক ঝঞ্ঝা-বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সব মিলিয়ে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত বিবরণ প্রাধান্য পায় শেষ পরিচ্ছেদে। এখানেও ভাষা শহিদ অহিউল্লাহ'র ছায়া প্রদীপ্তর চেতনায় সামনের দুঃস্বপ্নের দিনের ভীতিবোধ জাগ্রত করে।

'জেলগেট থেকে বেরুবার সময় প্রদীপ্ত দেখলো অহিউল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। অহিকে দেখতে চায় না। কিন্তু দেখতে না চাইলে কি হবে অহিউল্লাহ ওর পিছু ছাড়লো না। এই শহরের সর্বত্র ও দেখতে পায় অহিউল্লাহকে, ছায়ার মতো লেগে আছে। ও চেঁচিয়ে বলে, ওহি ভাই দোহাই লাগে, তুমি আমার পিছে ঘুরবে না। আমার সামনে তো সুদিন। তবু কেন তুমি আমাকে দুর্দিনের ভয় দেখাচ্ছো। কিন্তু অহি তো কথা বলে না। ও কি বোবা হয়ে গেছে? নাকি এটা অহির ছায়া নয়, অন্য কেউ? প্রদীপ্ত ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলে মঞ্জুলিকা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'[৫৯]

বারবার অহির উপস্থিতি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা ত্রয়ী'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অহির মতো তরুণরাই এদেশের ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রথমে সাড়া দিয়েছিলো। রাজনীতিসংলগ্ন না হয়েও তাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা আমাদের জীবনের নতুন উপলব্ধির প্রতীক। এজন্যই হয়তো অহির বারবার আবির্ভাব, চেতনা থেকে অবচেতনে আনাগোনা।

৫.

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ী উপন্যাসে সেলিনা হোসেন নিকট ইতিহাসের কাঠামোকে অবিকৃত রেখে বৃত্ত রচনা, ঘটনার বিস্তার এবং অধিকাংশ চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। এজন্য তাঁর অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠতায় রূপায়িত। এই ত্রয়ী উপন্যাসের উপস্থাপন পদ্ধতি বর্ণনাত্মক হলেও প্লট বিন্যাসের বহুমাত্রিক ও চরিত্রায়নের নিগূঢ়ভঙ্গি একে মহাকাব্যিক ফর্মের স্বভাবে উন্নীত করেছে।

৪৭-এর ভারতবিভাগজনিত কারণে একটি পরিবারের পূর্ব পাকিস্তানের আগমনের পর ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের পরিবর্তনের ক্রম অভিজ্ঞতার তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্ত উন্মোচনে আলোচ্য ট্রিলজি অন্তঃগূঢ় ক্রিয়াশীলতায় ও ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের সার্থকতায় শিল্পশোভিত। এজন্য বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের জটিল, দ্বন্দ্বময় সময়চারিত্র্য এবং বাঙালির ইতিহাসের নবরূপায়ণের বিশিষ্ট দিকটি উপন্যাসে হয়ে উঠেছে প্রধান।

ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপজীব্য করে ১৯৪৭-১৯৭৫ কালপর্বের মহাকাব্যিক সময়সারণির গতি-প্রকৃতি এবং দ্বন্দ্বজটিল রাজনীতিপ্রবাহের বহির্বাস্তবতা ও

অন্তর্বাস্তবতার অনুপুঙ্খ রূপায়ণ 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ট্রিলজির বিশেষত্ব। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের ব্যাপক আন্দোলন-আলোড়নের রাজনৈতিক কর্মধারা, তার দ্বন্দ্বময় চরিত্ররূপ এবং ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের বক্তব্য প্রকাশের প্রশ্নে আলোচ্য ট্রিলজি তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসের সময় স্রোতের পুনর্নির্মাণে চরিত্রের সর্বাবয়ব প্রেক্ষাপট উন্মোচন গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ পটভূমির বিচারে এজন্য গায়ত্রী সন্ধ্যা ট্রিলজির প্রদীপ্ত, প্রতীক, মঞ্জুলিকা, অধ্যাপক আলী আহমদ, নসিব, অহি প্রভৃতি চরিত্র উপন্যাসটির মানবমুখিতায় ভাস্বর। সংগ্রামশীল জীবনচেতনায় প্রখর উজ্জ্বলতায় দীপ্তমান প্রদীপ্ত, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের অন্তরঙ্গ আকাঙ্ক্ষার সময়কে অতিক্রমণে সক্ষম প্রতীক, সংসারের মনোহর দর্পণ মঞ্জুলিকা, শতকণ্টকের যন্ত্রণা অতিক্রান্ত মাতৃসর্বংসহা পুষ্পিতা, আত্মসন্ধান-সত্তাসন্ধান-জাতিসত্তাসন্ধানের নিগূঢ় ভাবনাবীজে আশ্লিষ্ট ও বেদনাজনক পরিণতিতে চির জ্যোতিরিঙ্গ আলী আহমদ, মুক্তিসংগ্রামের দ্বিধাহীন উৎসর্গীকৃত নিষ্কলুষ প্রাণ অহি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানবচৈতন্যের প্রাগ্রসরতার স্মারক নসিব এবং ছোটবড় বিচিত্র চরিত্রমালার চিত্রায়ণ ঔপন্যাসিকের শিল্পনির্মিতির স্মরণীয় প্রান্ত। সেলিনা হোসেন সময় প্রবাহের সংগ্রাম শুধু নয়, সমকালীন জীবন প্রবাহ ও তার অন্তর-বাহিরকে চিত্রায়িত করেছেন আলোচ্য ট্রিলজিতে। সংঘর্ষ ও রক্তপাতের প্রাবল্যের মধ্যেও তিনি মানুষের অন্তর্জীবনকে বিস্মৃত হননি। প্রদীপ্ত-মঞ্জুলিকা, প্রতীক-বন্যা, নসিব-নাসিমা প্রভৃতি প্রেম ও প্রণয়ের পরিণতি উপস্থাপন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ঢাকার রেসকোর্সে প্রদীপ্ত-মঞ্জুলিকার প্রণয় সংলাপ স্মরণ করা যেতে পারে- 'চারদিকে যখন মানুষ যুদ্ধের তোড়ে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, তখন তুমি প্রেমের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছো.../আমি যদি যুদ্ধে গিয়ে মরে যাই তখন তুমি কি করবে মঞ্জুলি?... /না, কখনোই তা হবে না। প্রদীপ্ত মঞ্জুলিকার হাত চেপে ধরে। গাঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরবো। আমাদের ছেলেমেয়েদের যুদ্ধের গল্প শোনাবো।/ ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মঞ্জুলিকা বলে, আমরা বুড়ো হয়ে গেলে মনে করবো যুদ্ধের সময়টা আমাদের জীবনে এক দারুণ সময় ছিলো।'[৬০] 'সমষ্টির বেঁচে থাকার আধার বিশাল, গভীর এবং আকাশ, পাতাল, মর্ত্যে পরিব্যাপ্ত'[৬১] তাই সেই চেতনার আকাঙ্ক্ষা লালনকারী নসিব সমকালকে ধারণ করে ব্যক্তি জীবনের নির্মম পরিহাসে। মাতৃহীন সংসারে পিতার নির্লিপ্ত আত্মমগ্ন আচরণ, সাংসারিক আবেষ্টনীর শৈথিল্য বাতাবরণ নসিবকে নিঃসঙ্গতা আক্রান্ত করলেও, সে আত্মগহ্বরে নিমগ্ন হয়নি বরং সময়ের ন্যায্য দাবির কাছে আত্মপ্রকাশ করার উদগ্র বাসনা থেকে সৃষ্টি করেছে শিল্প। অন্যদিকে সোনাখালি গ্রামে মঞ্জুলিকার চাচা কুদ্দুস প্রেসিডেন্টের কন্যা জোছনার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ রয়্যানি গানের গায়ক বিমলের জীবনকথা ও যুদ্ধোত্তর দেশে তার মর্মান্তিক পরিণতির বিবরণ এবং একইসঙ্গে কমিউনিস্ট ব্লকের তৎকালীন রাজনৈতিক ভূমিকা সঠিক তথ্য উন্মোচনের প্রয়াস আলোচ্য ট্রিলজির 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় হয়-কিন্তু স্বাধীনতার জন্য চাই একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ-'[৬২] বক্তব্যকে ধারণ করে বৃত্তায়িত হয়েছে।

ঘটনাক্রমে এবং চরিত্র-পাত্রের আচার-আচরণ ও উচ্চারণে বৃহৎ সময়ের গতিধারার অন্তরঙ্গ অবলোকন উপন্যাসে অভিব্যক্ত। এদের মধ্যে আলী আহমদের মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ক্রিয়াশীলতা, রাষ্ট্রীয় জীবনের রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক ধর্ম-এষণার বিপ্রতীপে উপস্থাপিত হয়ে ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের মর্মবাণীকে আলোকিত করেছে। চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি উপন্যাসের জন্য অনিবার্য

হয়ে উঠেছে। পরিচর্যা পেয়েছে বহুমাত্রিকতা। কখনো বিবরণ, ইতিহাসের উপকরণের হুবহু উপস্থাপন, কখনো আবার রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে চরিত্রের অন্তরজীবনের সংগ্রাম ও সংরাগকে একীভূত করে গীতময়, চিত্রময়, চিত্রকল্পময়, নাট্যিক, ম্যাজিক রিয়ালিজম পরিচর্যা প্রসিদ্ধ প্রাধান্য লাভ করেছে। বিষয়ের প্রলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সময়চেতনা, জীবনচেতনা এবং শ্রেণিচেতনার রাসায়নিক সংশ্লেষে আলোচ্য ট্রিলজি প্রাগ্রসর শিল্পকর্ম। আলী আহমদের মর্মন্তুদ পরিণতি, প্রতীকের আত্ম-রূপান্তর, প্রদীপ্তর অন্তর্ময় ও সংবেদনময় জীবনের রক্তাক্ত পথযাত্রার অভিজ্ঞতা-অনুষঙ্গ জীবনের সমগ্র রূপের শিল্পশৈলীতে অভিষিক্ত হয়েছে 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ট্রিলজি। তবে উপন্যাসের মধ্য পর্যায়ে এবং তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের দ্রুত অবরোহী পটভূমি পরিবর্তন পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হতে পারে। কিন্তু নায়ককল্প সময়স্রোতের সঙ্গে রাজনীতি সচেতন অস্তিত্বকামী চরিত্রের ইতিবাচক পরিণাম নির্দেশনা ঔপন্যাসিকের মৌল প্রতিপাদ্য মনে করার কোন কারণ নেই। চরিত্রের পরিণামই তার দৃষ্টান্ত। মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ্ত শেষপর্যন্ত এক হাত ও এক চোখ হারানো পঙ্গু মানুষ, প্রতীক কারাগার প্রকোষ্ঠে বন্দি, পুষ্পিতা কেন্দ্রচ্যুত, ক্লান্তিতে অবসন্ন, মঞ্জুলিকা সন্তান কেন্দ্রিক আবহে নিমগ্ন, বিমল রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত-প্রভৃতি উদাহরণ এ মন্তব্যের সপক্ষে উল্লেখ যথেষ্ট। তবে কি ঔপন্যাসিক সময়ের জটিলাবর্তে নেতিবাচক জীবনার্থে বিশ্বাসী? না, তা নয়। অহিউল্লাহ তার জলন্ত সাক্ষী। শহীদ অহিউল্লাহ'র ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণ তাই বস্তুসংঘর্ষতাড়িত হৃৎস্পন্দনে হয়ে ওঠে তরঙ্গিত ও প্রাণময় : 'প্রদীপ্তর মনে হয় ভাস্কর্যের জন্য ফেলে রাখা ইট-সুরকির নিচে ও চাপা পড়ে যাচ্ছে। ও প্রাণপণ চিৎকার করে অহিকে ডাকতে চাইছে, কিন্তু অহির নাম ওর মুখে আসে না। ও বলে যায়, মধুদা তুমি কোথায়? তুমি কি তোমার চায়ের ক্যান্টিনে বসে ছেলেদের চা খাওয়াচ্ছো? নাকি আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছো? তাহলে তোমার হাতটা আমাকে বাড়িয়ে দাও। আমি একটু ধরি। তোমার হাত ধরলে আমার ভয় কেটে যাবে মধুদা। রাস্তায় সাই করে গাড়ি চলে যায়, আকাশে তারার বুদ্বুদ।'[৬৩]

ভবিষ্যতের সন্তান, যুদ্ধোত্তর দেশে প্রত্যাশিত প্রাপ্তির শূন্যতার মজ্জমান প্রদীপ্তর ছোট ভাই প্রতীক বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমাকে মেনে নিতে পারেনি বলেই একসময় সে 'সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে পরিপূর্ণ' করার সম্ভাবনায় পারিবারিক সম্পর্কসূত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার নির্মম উপলব্ধি : 'এ দেশের জন্য বাবা দিয়েছেন জীবন, মা দিয়েছেন ঊনত্রিশ বছরের সংসার, তুমি (প্রদীপ্ত) দিয়েছো চোখ আর হাত, আমি দিয়েছি আমার ভালোবাসা (মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌযোগে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানী বন্যা, পিতামাতাসহ নিহত হয়), ভাবী দিয়েছে তার পুরো পরিবার (সৈয়দপুরে বিহারিদের আক্রমণে মঞ্জুলিকার পিতা-ভাইবোনের মর্মান্তিক মৃত্যু)। এরপরও দালালদের বিচার হবে না? ওরা ক্ষমা পাবে?'[৬৪]

প্রতীকের এই বাস্তব উপলব্ধি, মঞ্জুলিকার 'যুদ্ধ আমাদের আলাদা করে ফেলেছে' অনুভব এবং প্রদীপ্তর রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভীতিচেতনা ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকিত : 'মায়ের পাশে বসলে প্রদীপ্তর মনে হয় খোলা মাঠের রোদ এবং আলো কমে যাচ্ছে-এক বিশাল ছায়া এগিয়ে আসছে। সে ছায়ায় দুটো পা দেখা যায় শুধু, ও শক্ত মুঠোয় পুষ্পিতার হাত চেপে ধরে। পুষ্পিতা ওকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস না করে বলে, ভয় কিসের, আমি তো আছি। ছোট্ট দীপু ভুতের ভয়ে কাতর হলে পুষ্পিতা তো ওকে এভাবেই অভয় দিতো।'[৬৫]

ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত বর্ণনার পরিবর্তে সময়কে ধারণ করার গীতময় বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় বেশী। যেমন-নিম্নোক্ত অংশটি : '... যুদ্ধ ওকে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। শুধু ওকে বদলে দিয়েছে এতো দিনকার চলে আসা ধারণা, মূল্যবোধ। এই দ্রুত ধাবমান সময়কে ধরতে পারলো না রাতের রেলগাড়ি-আলোর দিকে না গিয়ে চলে গেলো অন্ধকারে। এখন রাত এবং দিনের বিশাল পার্থক্য, সময় আর যেতে চায় না, প্রদীপ্ত মনপ্রাণ দিয়ে মঞ্জুলিকার গুনগুন ধ্বনি শোনে, যেন এক শ্যামল সময় ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ওর ভেতরটা ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতোক্ষণ ও এই ধুয়ে রাখার অনুভবকে ধরে রাখতে পারবে?'[৬৬]

জাতীয় জীবনে নৈরাজ্য ও অরাজকতার ক্রমবর্ধমান বিকাশ স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে। তাই 'মঞ্জুলিকা বিষাদ-কণ্ঠে বলে, সময়টা ভীষণ খারাপ। আমার স্বস্তি নেই। ব্যক্তিগত জীবনও নষ্ট হয়েছে।'[৬৭] এই চেতনা প্রদীপ্তর 'সময়টা খারাপ নয়, সময় আমরাই তৈরি করবো। সময়টা আমাদের মঞ্জুলিকা'[৬৮] বিপ্রতীপে হয়ে ওঠে আশাবাদীতায় ভাস্বর মহাকব্যিক সময়প্রবাহ।

সময়ের দীর্ঘ পথযাত্রায় কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রেলপথ থেকে শুরু করে জলপথ ও রাজপথে প্রদক্ষিণ শেষে সংগ্রহ করেছেন জীবন্ত মানুষের কার্যকলাপ, পরিহার করেছেন তিক্ততাকে, ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন রোমান্টিক আবহসমূহকে। ১৯৪৭-এর এক অপরাহ্ণের পর সায়াহ্ন মুহূর্তে যে রেলে প্রবাহমান মানব-মানবী চলতে শুরু করেছিলো তা সময়ের প্রয়োজনে বিরাম নিলেও অবশেষে রাজপথই সেই মানব-মানবীকে পৌঁছে দিয়েছে সার্থক রূপান্তরিত জীবন অভীপ্সার প্রান্তে। বস্তুত বাঙালি জাতির জীবন ও রাজনীতিপ্রবাহের নাটকীয় রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের চারিত্র্য নির্দেশে ও তার রূপান্তরধর্মীতা উন্মোচনে মহাকাব্যিক সময়সারণি প্রতিবিম্বিত চিত্রায়ণ গায়ত্রী সন্ধ্যা ট্রিলজি; শিল্পময় অভিব্যক্তিতে প্রসারিত।

তথ্যঋণ :

১. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি ঢাকা ১৯৯৫।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ : পটভূমি ঢাকা', বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
৬. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা: এক, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ ২০ ।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯ ।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩।
১৫. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
১৬. সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩০।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭।
১৮. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
১৯. সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৬।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৯।
২১. প্রাগুক্ত, ২৭৬।
২২. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৫, ভূমিকা।
২৩. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. আলী আনোয়ার, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর, বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ-উপন্যাস বিষয়ক পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা, একুশের প্রবন্ধ ৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ ১০৫ ।
২৭. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা : দুই, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬ ।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।
২৯. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
৩০. সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১।
৩১. সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১।
৩২. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
৩৩. সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৯।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩০।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪।
৪০. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা : তিন, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, ভূমিকা।
৪১. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত।
৪২. প্রাগুক্ত।
৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. আবু ইউসুফ, ইতিহাসের সৃষ্টি : ইতিহাসের স্রষ্টা, লোকায়ত, চতুর্দশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ ৩০।
৪৫. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা : তিন, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫ ।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২।
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৭-৭৮।
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৬।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৬।
৫৮. প্রাগুক্ত, ১৮৯।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
৬০. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা: দুই, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪ ।
৬১. সেলিনা হোসেন, গায়ত্রী সন্ধ্যা: দুই, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯১।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ২৯৩।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩।